আমার বন্ধু উৎপল

যোগেন চৌধুরী

ছয়ের দশকের গোড়া থেকেই উৎপল, তুষার (রায়) এদের সঙ্গে আমার পরিচয়। কফি-হাউসের আড্ডা কিংবা বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে সে সময়কার অনেক তরুণ কবিদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ ঘটত। অবশ্য তুষারের সঙ্গে যোগাযোগ হয় আকাদেমি অব ফাইন আর্টসের চত্বরে। ওর প্রথম দিককার কবিতা 'নান্দীমুখ'-এ ছেপেছিলাম আমরা। বিনয় মজুমদারের কবিতা আমার প্রথম থেকেই ভালো লাগে। তুষারের কাছ থেকে নানা পত্র-পত্রিকা পেতাম। উৎপলের 'পুরী সিরিজ'-এর এক কপি উৎপলই আমাকে দিয়েছিল— প্রথমবার ছাপা হয়ে বেরোবার পর। তার আগে থেকেই ওর কবিতা আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে।

তখন আমার চব্বিশ/পঁচিশ বছর বয়স। ১৯৬০ সালে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজের ডিগ্রি পাই। ১৯৬৫ সালে বৃত্তি পেয়ে পারির এক্কোল দ্য বোজার্ত-এ স্নাতকোত্তর শিল্প শিক্ষার জন্য ফরাসি দেশে যাই। সে-সময় প্লেনের চেয়ে জাহাজে পাড়ি দেবার খরচ ছিল অনেক কম। তা ছাড়া স্টুডেন্টস' কনসেশন-ও আমাদের

জুটে গিয়েছিল। আর জাহাজযাত্রার একটা আলাদা আকর্ষণ তো ছিলই। সুয়েজ খাল দিয়ে যাবার সময় ডান দিকে পড়ে আরবদেশ, দীর্ঘ জায়গা জুড়ে। পাথুরে এলাকা আর পাহাড়। গাছপালা বলতে কিছু নেই। বিকালের সোনালি রোদ এসে পড়ে ওই পাহাড়ের গায়ে, এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। জাহাজ গিয়ে থামত মার্সাই বন্দরে।

পারি-তে তখন একটা থাকার জায়গা পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। সৌভাগ্যক্রমে সে বছর একটা জায়গা আমরা পেয়ে যাই। বিভিন্ন দেশের বৃত্তি পাওয়া ছাত্র-শিল্পীরা সেইখানে থাকতেন। পরে কেবলমাত্র কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পীরাই ওখানে থাকার সুযোগ পেয়েছেন। অন্যদের ক্ষেত্রে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আমরা তিনজনই (আমি, দীপক ব্যানার্জি আর সুহাস রায়) ওখানে থাকতাম। আমার স্টুডিয়োর নম্বর ছিল ২১৪। বিল্ডিংটার নাম ছিল সিতে আঁত্রন্যাশিওনাল দেজ আরত। সে-সময় উৎপলও কলকাতার কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে একটা জব ভাউচার জোগাড় করে লন্ডনের পথে পারি-তে গিয়ে হাজির হয়। যাত্রাসঙ্গী ছিল রেকসিনের একটা সুটকেস, তাতে জামাকাপড় আর জিনিসপত্র ঠাসা। সন্দীপনের লেখা পড়ে জেনেছিল ও নাকি কলকাতার ঘর-টর, দামি জিনিসপত্র মায় পিয়ানো পর্যন্ত বিক্রি করে বিদেশে পাড়ির টিকিট আর অন্যান্য খরচের ব্যবস্থা করেছিল। যতদূর মনে পড়ে, এয়ারপোর্ট থেকে এসে বাস যেখানটায় থামত সেখান থেকে আমিই ওকে নিয়ে আসি। খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল উৎপলকে। মুখে চোখে একটা স্বস্তি আর আনন্দের ছাপ—'শেষ পর্যন্ত এসে গেছি তাহলে!' পারি-তে পৌঁছে প্রথমেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের সব জিনিসপত্র বাতিল করে ফেলল ও। যদিও তা সবই যথেষ্ট ব্যবহারযোগ্য ছিল। কিন্তু ওর যুক্তি ছিল—ওই পরিবেশে নাকি ওগুলো একদম মানানসই নয়। আমাকেও বলল পুরনো শেভিং সেট ইত্যাদি সব ফেলে দিতে। শুদ্ধু হল টুকিটাকি টয়লেট, বিশেষ ধরনের সব জামাকাপড়, টাই ইত্যাদি কেনার পালা। সেই রেকসিনের সুটকেসটা এদেশেও দীর্ঘকাল আমার কাছে ছিল। ব্যবহারও করেছি রীতিমতো। সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে বাড়ি পরিষ্কার করার সময় বোধহয় ওটা ফেলে দিয়েছি।

পারি-তে আমাদের থাকার জায়গার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধে ছিল। বাইরের কাউকে থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে ছিল কড়া নিষেধাজ্ঞা। মঁসিয়ে লংগে নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন ওখানকার ডিরেকটর, কাউন্টারের সামনেই বসে থাকতেন। মারী নাম্নী এক মহিলা ছিলেন তাঁর সহকর্মী—দেখা হলেই সম্ভাষণ জানাতেন। এছাড়া প্রতিদিন সকালে ঘরদোর সাফ করার জন্য একজন মেয়ে আসত। এদের সকলকার নজর এড়িয়ে উৎপলের থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। সামনের দিকের দরজা ব্যবহার না করে পিছনের দিক দিয়েই যাতায়াতের ব্যাপারটা সারতাম। সৌজন্যের খাতিরে, থাকার অসুবিধের ব্যাপারটা উৎপলকে আমরা না বললেও ওর প্রখর বুদ্ধিতে চট করে ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়। কলকাতা থেকে কার যেন ঢাউশ একটা ওভারকোট নিয়ে গিয়েছিল

পারীতে উৎপলকে যেমন মনে পড়ে।

উৎপল। ওতে আপাদমস্তক ঢেকে ভারিক্কি চালে যখন হাঁটত তখন ওকে মানাতও খুব, হাঁটার ভঙ্গি দেখে বহিরাগত হিসাবে কারুর ওকে সন্দেহ করার উপায় থাকত না। সকলের নজরকে ফাঁকি দিয়ে ও আসত রাত্রিবেলা, আবার সকাল হলেই বেরিয়ে পড়ত। ঘুরে ঘুরে রাস্তাঘাট চেনা আর ছোটখাটো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো— এটা ছিল আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। সাহিত্যিক হুইটম্যানের কোনো আত্মীয়ের একটা বইয়ের দোকান আছে প্যারি-তে। 'Shakespeare & Co.' নামের এই বিখ্যাত দোকানটিতে পৃথিবীর নানা প্রান্তের লোকের আনাগোনা। অ্যান্টিক ধরনের একটা দোকান, তেমনই ভাঙাচোরা চেয়ার আর খয়েরি রঙের সব আসবাবপত্র। কবিরা আসতেন, কবিতা পড়তেন ওখানে, ওই ভাঙা চেয়ারে বসেই—কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। আনুষ্ঠানিকতার বালাইও ছিল না কোনো। দোকানের ভিতরেই শোওয়ার ব্যবস্থা। গিনস্‌বার্গের মতো কবিরাও ওখানে আসতেন। জায়গাটা উৎপলের ভীষণ প্রিয় ছিল। ও ওখানে খুব ফিট করে গেল। দারুণ উপভোগ করত। লক্ষ করেছি, কোনো ফর্মাল ব্যাপার কখনই ও পছন্দ করে না।

মাঝে মাঝে ছাত্রদের রেস্তরাঁতে গিয়ে খেতাম আমরা। তিন ফ্রাঁ-র মধ্যেই খাওয়া হয়ে যেত। বাড়িতেও রান্নার ব্যবস্থা ছিল আমাদের। চার-পাঁচ ফ্রাঁ-তে ভালো ওয়াইন পাওয়া যেত সে-সময়। সন্ধ্যায় বন্ধুরা আড্ডায় আসত মাঝে মাঝে। খেয়ালের বশে আমার কাছ থেকে তেল রঙ নিয়ে একদিন একটা ছবি এঁকেছিল উৎপল। মানুষের একটা মুখ, তাতে খোঁচা খোঁচা চুল দাড়ি সব। তলায় লেখা 'উৎপল'। ছবিটা সম্ভবত এখনও আমার কাছে আছে। গল্পের বিরাম ছিল না ওর। ওর পড়াশোনা অনেক, অ্যাকাডেমিক জগত থেকেই ও এসেছে। যেটা আমাদের ক্ষেত্রে অতটা নয়। তা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে ওর অদ্ভুত একটা মিল হত। কমিউনিকেশন এর লেভেল-টা মূলত ইনটুইটিভ অনুভূতির ওপর গড়ে উঠেছিল। ওর সঙ্গে আলাপের গোড়া থেকেই এটা আমি অনুভব করতাম। ওকে আমার ভালো লাগত আর এই ভালো-লাগার জায়গা থেকেই ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ। সেই 'পুরী সিরিজ'-এর সময় থেকেই ওর কবিতা আমাকে আকর্ষণ করে। নানা ধরনের জিনিস সম্পর্কে অবারিত ওর কৌতূহল আর সব কিছু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা ওর এক স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। আর প্রায়ই ও নানারকমের নতুনত্ব সে-সবের মধ্যে খুঁজে পেত। ছোটখাটো বহু জিনিস ওর চোখে পড়ত আর তা নিয়ে অদ্ভুত গল্প করতে পারত। আমার কেমন যেন মনে হয়, উৎপল দত্ত আর উৎপল বসু—এদের দুজনের মধ্যে কোথাও চেহারার একটা মিল আছে। ঢোলা ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে যখন হাঁটত তখন ভঙ্গির একটা বিশেষত্ব ফুটে উঠত। ওকে দেখলে একটা শব্দ আমার মাথায় আসত : 'বায়স'। সম্ভবত সেটা ওর কাল্পনিকতাপূর্ণ আবার সন্দেহভরা বড় বড় চোখদুটোর জন্যেই। দোকানের শো-কেসগুলো ঘুরে ঘুরে দেখাটা ছিল একটা মজার নেশা। হাঁটতে হাঁটতে হয়ত হঠাৎ কোথাও থেমে গেল। রু শাঁ মিশেল, রু শাঁ জারমা দ্য প্রে, এক্কোল দ্য

বোজার্ত, মোমার্ত, মোপারনস্— এসব জায়গায় আর নানা কাফেটেরিয়ায় আনাগোনা ছিল আমাদের। মাঝে-মাঝে বিয়ায় পান চলত। সব সময়ই যে শিল্প বিষয়ে কথাবার্তা হত— এমনটা নয়। মুখে মুচকি হাসি আর বুদ্ধিদীপ্ত তাকানোর ভঙ্গি সহ উৎপল যে কোনো বিষয়ের আলোচনাই জমিয়ে তুলতে জানত। ড্রিংকস উপভোগ করত খুব। লন্ডনে থাকাকালীন একবার বলেছিল, মেয়েদের চেয়ে ড্রিংকসটাই ওর কাছে বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। বিশালাকার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখা ছিল ওর আর এক নেশা। বিরাট বিরাট বাড়ি জুড়ে দোকান, তার এক-এক তলায় এক-এক রকমের পণ্যসম্ভার। সুন্দরী মেয়েরা সব সেলস্-গার্ল। সারাদিন ধরে শুধু দেখতাম— কচিৎ হয়ত টুকিটাকি কিছু কেনা হত। এছাড়া পারির বিখ্যাত সেক্স-শপ আর প্রসটিটিউটদের মহল্লাগুলোও (পীগাল) দেখেছি আমি আর উৎপল। এমন সব জায়গা আছে যেখানে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে হয়।

উৎপলের ভীষণ আগ্রহ ছিল কবর দেখতে যাওয়ায়। পারির কোথায় কোন্ প্রখ্যাত ব্যক্তির সমাধি তার শুলুক-সন্ধান কলকাতা থেকেই জোগাড় করে রেখেছিল ও। আপলিন্যের-এর কবর দেখার ব্যাপারে ওর উৎসাহের কথা আমার মনে পড়ছে। সম্ভবত বোদলেয়ার-এর কবরও দেখেছিলাম আমরা। সেই কবরখানা থেকে সংগ্রহ করা গাছের একটা পাতা আজও আমার কাছে আছে। এছাড়া 'প্যানথিও' নামে বিখ্যাত লোকেদের যে সমাধিক্ষেত্র— আমরা দুজনে তা দেখতে গিয়েছিলাম। সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনেই ছিল— এই ঐতিহাসিক সমাধিক্ষেত্রটি। এ সমস্ত কিছু দেখার মধ্যে একধরনের বিস্ময়-বোধ কাজ করত উৎপলের— যদিও ওর অধ্যয়নশীলিত পরিণতমনস্কতার কারণে সেটা সবসময় বোঝা যেত না। বিখ্যাত 'লুভ' (Louvre) সংগ্রহশালা আর 'মোনালিসা' ছবি দেখার সময় আমার সঙ্গী ছিল উৎপল। কয়েকটা দিন ধরে আমরা সেখানে ঘুরেছিলাম।

উৎপল এর পরে লন্ডনে চলে যায়। সেখানেই ওর চাকরি ঠিক হয়েছিল। পরের বার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পারি আসে। সেটা ছিল টুরিস্টের কেতায় এক ভ্রমণ। হোটেল ভাড়া করেছিল। এর আগেই আমি ক্যামেরা কিনে ফেলেছি। লুভ সংগ্রহশালার ভিতরে তখন উৎপলের একটা ছবি তুলেছিলাম। দশ-বারো দিন ছিল আড্ডা চলেছিল প্রচুর। আর ওর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেবার ভার্সাই যাই। খুব হৈ হৈ করে কেটেছিল সে ক'দিন।

বস্তুজগত সম্পর্কে উৎপলের এক অদ্ভুত চেতনা আছে যা আবার ওকে স্পর্শ করে থাকেও না সবসময়। বাস্তবতা-অবাস্তবতার অন্তর্বর্তী কোনো স্তরে ওর অবস্থান। রামকৃষ্ণের উপমায় : জলের ভিতরে যেন হাঁস। ওর সকল ভাবনার পিছনেই নতুন একটা দৃষ্টিকোণ থাকে— তৃতীয় কোনো দৃষ্টিকোণ। বাস্তবতা ও কাল্পনিকতা (Reality এবং Fantasy) মিশে থাকে সে দেখায়। কল্পলোক ও ভাবনার ভিতরে কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে বলি। ভবানীপুরের বাড়ি ছেড়ে একসময় ও উঠে এসেছিল রয়েড স্ট্রিটের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পাড়ায়। তিরিশ-চল্লিশ ফুট দৈর্ঘ্যের অদ্ভুত লম্বাটে ধরনের

একটা ঘরের মধ্যে ছিল ওর আস্তানা। ওই অস্বাভাবিকতাই উপভোগ করত ও। শিল্প সম্পর্কে ওর যে আগ্রহ তাতেও এই কল্পলোকের প্রভাব কাজ করে বলে আমার ধারণা। হঠাৎ কোনো কিছু ভালো লাগছে— বিশেষ কিছু চোখে পড়ল— কিন্তু তার মধ্যেই একটা যাথার্থ্য থাকে। কবি হিসেবে কতগুলো জিনিস ও বিশেষভাবে বুঝতে পারে যা হয়ত অন্যেরা পারে না। ওর অনুভবের একটা বিশেষত্ব টের পাওয়া তখন। ফ্রান্সে নানা জায়গায় ভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে এটা খুবই মনে হত আমার। মনে পড়ছে, ভার্সাইতে গিয়ে ও কীরকম ভাবে মারী আঁতোয়ানেত-এর গল্প বলতে শুরু করে দিয়েছিল।

উৎপল লন্ডনে থাকাকালীন বারদুয়েক আমি যাই। প্রথম বারে উৎপল ছিল না, দ্বিতীয় বারে যখন দেখা হল, এক অন্য উৎপল— এক বিপরীত উৎপলকে দেখলাম যেন। সেই 'কফি-হাউসের উৎপল', 'চাকরি চলে যাওয়া উৎপল'-এর সঙ্গে তার অনেকটাই ফারাক। স্বামী-স্ত্রী দুজনে চাকরি করছে, ফ্ল্যাট নিয়েছে একটা। খুঁটিনাটি আসবাব-পত্র থেকে শুরু করে ঘর সাফ করার মেশিন— এইসব যা দেখত তাই কিনে ফেলত তখন। অদ্ভুত একটা ঝোঁক। শীতের সময়, খুব একটা বেরুত না। একটা টিভি ভাড়া করে এনেছে, সন্ধ্যায় তারই সামনে বসে থাকে। খুব একটা ঘোরাঘুরির অভ্যেস এখনও ও করে না; হয়ত একবার কোথাও গেল, সারাবছর ধরে তারই গল্প চলল। লন্ডনে ফারুক হায়দার নামে এক বন্ধুর বাড়িতে তখন আমাদের আড্ডা বসত। আমি আর ফারুক ছাড়াও বিমল ব্যানার্জী, অজু চৌধুরী, গ্যারি ম্যাকিম প্রমুখ সে আড্ডার নিয়মিত অংশীদার ছিলেন। উৎপলকে ওখানে খুব একটা পেতাম না আমরা, হয়ত কোনোদিন রেস্তরাঁয় যাব ঠিক হল, সেদিন ও এল।

কবিতায় ওর শব্দচয়ন আর নির্মিতি কল্পলোক আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করে। পরিশীলিত এক যাত্রা যা উচ্চাঙ্গের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। ও নিজেও উঁচুদরের এক চরিত্র। লেখার মধ্যে অনায়াসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে; অত্যন্ত নির্দ্বিধ এই প্রকাশ। একটা পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ক্ষেত্র খুলে যায় যেন। কবিতায় আমরা খুঁজে পাব অনন্য সব 'ইমেজারি'র ব্যবহার: 'আমার বসন্তদিনের চটি হারিয়েছি বাদাম পাহাড়ে', গড়ে অর্থ উঠে আসে, অলৌকিক এক ভাব সৃষ্টি হয়। অলৌকিক আর লৌকিকের অপূর্ব মিশেল এইসব কবিতায় সৌন্দর্যবোধের একটা সম্পূর্ণতা খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষা নামমাত্র এক ব্যবধান, নইলে কবিতায় এই রূপনির্মাণ, এই সৌন্দর্যবোধের আবেদনে উৎপলের ব্যাপ্তি তো আন্তর্জাতিক। সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এই কবিকে বোঝার, তার ভাষাবিন্যাসের অন্তর্গত চিন্তাকে অনুধাবন করতে পারার মতো পাঠকের সংখ্যা কম হওয়াটাই স্বাভাবিক। জনপ্রিয়তার নিরিখে এদের বিচার চলে না। রবীন্দ্রনাথকেই বা ক-জন বোঝেন? তাঁকে গান লিখতে হয়েছিল ভেবে-চিন্তেই। উৎপলের 'নাম' হয়নি বলে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই আমরা, আর উৎপল নিজে তো নয়ই। ও বিদেশে কাটিয়েছে দীর্ঘ সময়। তখন ওর অভাববোধ করেছি খুব। বাংলা ভাষার এই কবি

কলকাতায় ফিরে এসে নিজের ভাষায় কাজ শুরু করুক— এটা খুব চাইতাম। নানা-দিক থেকেই ওর ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ সম্পর্কিত নানা বিষয়ে কার্যকর নানা ভাবনাই আছে ওর। কিন্তু ওর অলস স্বভাবের জন্য ভিতর থেকে টেনে বার করতে হয় সেইসব কথা। সেগুলি কতটা কার্যকর হয়ে উঠবে এ নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই। এই বৈপরীত্য ওর মধ্যে সর্বদা দেখতে পাই।

শব্দ পাশাপাশি বসে এক ঝংকার সৃষ্টি করে ওর কবিতায়। প্রথম দিকটায় হয়ত জীবনানন্দের সঙ্গে সামান্য সুরের মিল ছিল পরে যা একেবারেই অনুপস্থিত। শিল্পের উৎকর্ষ পরিমাণ দিয়ে বোঝানো যায় না, গুণগত বিচারেই তা উপলব্ধি করতে পারি আমরা। শ্রেষ্ঠ চিত্রকর সাদা কাগজে আঁকেন একটি রেখা যা স্পন্দিত হতে থাকে। শ্রেষ্ঠ কবির রচিত একটি পংক্তিও তেমন স্পন্দন সৃষ্টি করে থাকে। জীবনানন্দের কবিতা পাঠে যেমন অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। এই সব মহৎ বৈশিষ্ট্যগুলি উৎপলের কবিতাতেও আছে। ওর ভিতরে সেই সম্পূর্ণ কবি আছে। পিকাসো যেমন যা ধরতেন তাই সোনা হয়ে যেত। এ গুণ অনেকে পরিশ্রম করে অর্জন করে। কিন্তু কেউ কেউ আছেন যাঁরা আপাদমস্তক শিল্পী। জীবনানন্দ-বিনয়-উৎপল এঁরা সেই জাতের। □